খিলাফা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন!

প্রশ্নঃ

সালাম আলাইকুম। আপনার বক্তৃতা থেকে আমি যা বুঝলাম তা হলো, আপনি বিশ্বাস করেন খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হলো জিহাদ। আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন কি?

“আরেকটি মত এখন উম্মাহর কাছে তুলে ধরা হচ্ছে তা হলো, শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সামরিক সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্ব দরবারে ফিরিয়ে আনা। আবার এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট হাদিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এটি ঈমাম মুসলিম সহ আরো অনেক সূত্র থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

‘কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির (শাসকের) বিরোধীতা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রকাশ্যকুফরী পাওয়া যায়, যা আল্লাহ থেকে(ইসলাম থেকে) সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়...’

ইবনে কাসীর তার তাফসিরে বলেছিলেন যে, যদি খলিফা কুফরী শাসনে ফিরে যায়, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও শারীয়াহর দিকে ফিরে যায়।

ইবনে হাযারও তার ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেছেন যে, যদি সে(অর্থাৎ খলিফা) কাফির হয়ে যায় বা শারীয়াহ পরিবর্তন করে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাকে উৎখাত করতে হবে।

এই মত নাইল আল-আওতারেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঈমাম শাওকানী এটি সমর্থন করেছেন। সুতরাং, যদি শাসক শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হয় তওবা করে অথবা তাকে উৎখাত করা হয়।

যাই হোক শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই এটি প্রয়োগ হবে অর্থাৎ যে খলিফা কুফরী আইন প্রবর্তন করে ও আল্লাহর অবাধ্য হয় তার ক্ষেত্রেই কেবল এই বিধান প্রযোজ্য হবে। এটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যখন খলিফা অত্যাচারী এবং

দুর্নীতিবাজ হবে। তবুও তার আনুগত্য করতে তারা বাধ্য এবং মুসলিমদের তার পিছনে নামাজ পড়া ও জিহাদ করা উচিত।

যাই হোক, এই হাদীসগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়। এইগুলো খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এই হাদীসগুলো যে শিরোনামে এসেছে তা হল 'খুরুজ মীন আল-খলীফা'(অর্থাৎ খলীফা বা ঈমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।))।

বর্তমান পরিস্থিতি এমন নয় যে, খলীফারা এতদিন ইসলামী অনুঃশাসন চালাতেন এরপরইসলাম থেকে ফিরে গেছেন। বর্তমান সমস্যা এমনও নয় যে শাসককে নিছক হত্যা করে সরাতে হবে।

বরং দীর্ঘ ৭৬বছরেরও বেশী সময় ধরে মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে কুফরী ব্যবস্থার(সিস্টেম) উপর আছে ;না কোন শাসক কখনো শারীয়াহ দ্বারা শাসন করেছে, না কেউ খিলাফা রাষ্ট্রের খলীফা। যে সিস্টেম তারা প্রয়োগ করে আসছে তা, গণতান্ত্রিক কাঠামোর আদলে হয় রাজতন্ত্র অথবা পূঁজীবাদ।

তথাপি, বাস্তবতা এই নয় যে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে খারাপ খলীফা অপসারন করা। বাস্তবতা হচ্ছে, এদের শাসকবর্গ সহ সমস্ত কুফরী সিস্টেমের মূলোৎপাটন করে, দারুল ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান শাসকবর্গ কোনভাবেই সেই খলীফার সাথে তুলনীয় নয়, যে কিনা খিলাফা রাষ্ট্রে একটি কুফরী আইনের সূচনা করেছেন।

কাজেই এই হাদিসগুলো, যেগুলো সবসময়ই দারুল ইসলামের(অর্থাৎ, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিমরা নিরাপদ) প্রেক্ষাপটে বুঝানো হয়েছে, সেগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যাবেনা। যেদিকে তারা নির্দেশ করছেন বাস্তবে তাহল ইসলামী রাষ্ট্রে কুফরি বিধান প্রবর্তনকারী খলীফার অপসারণ।

শাসকের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াই ও তাকে হত্যার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ কুফরী সিস্টেমের মূলোৎপাটন এর বাস্তব নির্দেশ নয়।

দলীল-প্রমাণ থেকে একমাত্র এই পরিস্থিতির সাথে যা তুলনীয় তা হলো - রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর দ্বারা একেবারে গোঁড়া থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটি প্রতিষ্ঠা করতে ও দারুল কুফরকে দারুল

ইসলাম এ পরিবর্তন করতে তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সংগ্রাম সেটিই।।

এই সংগ্রামের কথা তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন হামজার হাদিসে, যা পাওয়া যায় সুন্নাহ ও সীরাহ গ্রন্থগুলোতে। যেহেতু পূর্ণ কুফরী সিস্টেম থেকে পূর্ণ ইসলামী সিস্টেমে রুপান্তরের সেটিই একমাত্র উদাহরণ; সেহেতু এখনকার বিষয়টিও নিছক শাসক নয় বরং সিস্টেমের পরিবর্তনের সাথেই সম্পৃক্ত।

জিহাদের এই হাদিসটি শুধুমাত্র শাসক(অর্থাৎ বিপথগামী খলীফা, সিস্টেম নয়) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর মক্কায় রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংগ্রাম ছিল সিস্টেম পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত।

তাই সামরিক তৎপরতা(বা সংগ্রাম) খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নয়।" – এরই সাথে কি আপনি হিজব উত-তাহরির সম্পর্কেও আপনার মতামত জানাবেন? ।

জাযাকাল্লাহ খায়ের। সালাম আলাইকুম।

উত্তর দিয়েছেন শায়খ আবু আব্দুর রহমান রহঃ

খিলাফা পতনের পর প্রতিষ্ঠিত বেশীরভাগ ইসলামিক দলই খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। আশির দশক ও নব্বই দশকের দিকে এমন এক সময় ছিল যখন সালাফি'রা, ইখওয়ান, জামায়াত ইসলামি, হিজবুত তাহরির, জিহাদী দলগুলো এবং সুফীদের অনেকেই খিলাফার কথা বলত।

যেহেতু পশ্চিমা বিশ্ব পরিষ্কার করেছে যে, তারা এটি(অর্থাৎ খিলাফাত) পছন্দ করে না ও বরদাস্ত করবে না, সেহেতু তখন থেকেই কিছু দল খিলাফার কথা বলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিল এবং অন্যরা চুপসে গেল।

শুধুমাত্র গুটি কয়েক দল ইসলামি অনুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবানে দৃঢ়রইল।

খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ইসলামী দলগুলোর প্রস্তাবিত পদ্ধতি সমূহঃ

১। তারবিয়াহর মাধ্যমে এবং পরে যখন কোনভাবে আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন আসবে খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যখন অন্যরা বলে আমরা

তারবিয়াহ চালিয়ে যাবো যতক্ষন পর্যন্ত না উম্মাহ প্রস্তুত হয় এবং তারপর আমরা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে।

৩। হিজবুত তাহরিরের পদ্ধতি হল খিলাফার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উম্মাহর সচেতন বৃদ্ধি করা, মুসলিমদের রাজনীতি শিক্ষা দেয়া এবং নুসরাত (আনসারদের থেকে সাহায্য/সহায়তা) খোজা।

৪। আল্লাহর দীন(অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।

প্রথম পদ্ধতির প্রবক্তারা উম্মাহকে কখনোই কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দেন নাই যে কখনআমরা যথেষ্ট পরিমাণ(অর্থাৎ সেই মাত্রা পরিমান) তারবিয়াহ (নিবীড় পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষা) সম্পন্ন করে বাস্তবায়নের ধাপে অগ্রসর হতে পারি।

এর ফলে আমরা জিহাদের দ্বায়িত্ব উপেক্ষা করে চিরস্থায়ী তারবিয়াহর ধাপেই পড়ে থাকব।

তারা আরেকটি বিষয় ছেড়ে দেন আর তা হল, তারবিয়াহ এক প্রজন্মের মধ্যে একাধিক প্রজন্মে নয়। মানে হচ্ছে, যে পরিবর্তন রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এনেছিলেন, যা দাওয়াহ দিয়ে শুরু হয়ে জিহাদের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়েছিল এক প্রজন্মের জীবদ্দশায়।

এর সম্পূর্ণটা সম্পন্ন হয়েছিল ২৩বছরের মধ্যে। তাছাড়া উম্মাহর অন্য সব সফল পরিবর্তন এক প্রজন্মের মধ্যেই ঘটেছিল। ইতিহাস এর সাক্ষী।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রবক্তারা এই কথা বলে শুরু করেন যে, গণতন্ত্র কুফর এবং আমরা এতে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমরা এটিকে ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছি এবং আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার পর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব।

একথাই আমি শুনছি ৮০’র শেষ ও ৯০’র শুরু পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় সদস্য থেকে। আমার পরিষ্কার মনে আছে সেই গণ-আলোচনার কথা

যা ঘটেছিল এই বিষয়ের উপর কারণ, তখন সালাফীরা এই পয়েন্টে ইখওয়ানের ঘোর বিরোধী ছিল।

আমার এও স্পষ্ট মনে আছে ইখওয়ানের কয়েকজন শাইখের সাথে আমার সেই একান্ত আলোচনার কথা যেখানে তাঁরা বারংবার বলছিলেনঃ গণতন্ত্র অনৈসলামীক এবং আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এর(অর্থাৎ গণতন্ত্রের) মধ্যে থেকে সিস্টেমের পরিবর্তন করা।

এই পদ্ধতির মধ্যে তিনটি সমস্যা আছেঃ

প্রথমতঃ গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা এবং গণতান্ত্রিক সিস্টেমের অনুগামী বলে দাবী করা কিন্তু তাতে বিশ্বাস না রাখা – এটি একটি প্রতারণা ও মিথ্যাচার।

এখন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতারণা গ্রহণযোগ্য, যদি মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। সমস্যাটা হল, এই বিশেষ দলগুলো যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত; বিশ্বাস করে না যে তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে বরং বিশ্বাস করে যে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে চুক্তি আছে।

সুতরাং যদি আমরা কাফেরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকি তাহলে তাদের(কাফেরদের) সাথে প্রতারণা করা গ্রহণযোগ্য নয় এবং মিথ্যা বলাও গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই হচ্ছে প্রথম সমস্যা।

পরবর্তী সমস্যা হল, আপনি যখন একটি মিথ্যাকে যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে পুনরাবৃত্তি করবেন তখন শেষ পর্যন্ত আপনি তাই বিশ্বাস করবেন। যারা এইসব দলগুলোকে ৮০'র দশক থেকে দেখেছিলেন, সময়ের সাথে এইসব দলগুলোর যে কি পরিমাণ পরিবর্তণ ঘটেছে তা দেখে তাদের কাছে এটা বিস্ময়কর লাগে।

এখন তারা বলছে এবং আমিও তাদের বিশিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে বহুবার শুনেছি যে, এখন আমরা আসলেই গণতান্ত্রিক সিস্টেমে বিশ্বাস করি। আমরা বুলেট নয়, ব্যালটে বিশ্বাস করি। এবং যদি ব্যালট একটি ধর্মনিরপেক্ষ অথবা কাফের দলকে জয়ী করে তাহলে আমরা তাই গ্রহণ করব।

মুসলমান হিসাবে আমাদের, ইসলামকে মানুষের খামখেয়ালীর বিষয় বানানো উচিত না যে, যদি তারা এটি(অর্থাৎ ইসলাম/ইসলামী শরীয়াহ) বেছে নেয়

আমরা তা বাস্তবায়ণ করব আর যদি তা না করে তবে আমরা জনসাধারনের পছন্দ মেনে নিব।

আমাদের অবস্থান এই যে, আমরা পৃথিবীতে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করব ; জনসাধারন এটি পছন্দ করুক বা না করুক।

আমরা শরীয়াহ শাসনকে জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতার বিষয় বানাবো না। রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাকে তলোয়ার সমেত পাঠানো হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করা হয়। সেই পথ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ, যেই পথ আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

চূড়ান্ত সমস্যা হল, মুসলমানদের প্রক্রিয়া, অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া নয়। মুসলমানরা ওই(গণতন্ত্র) সিস্টেমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে না এবং তার মধ্যে থেকে কাজও করে না। এটি আমাদের পথ না। এটি ইহুদী ও মোনাফেকদের পথ কিন্তু মুসলমানদের পথ না। আমরা বন্ধু ও শত্রুর সাথে সৎ ও অকপট(বা অক্রুর)।

আমরা আমাদের উদ্দেশ্য উন্মুক্ত রাখি এবং আমরা প্রকাশ্যে আমাদের দাওয়াহ ঘোষনা করি, “তোমার জন্য তোমার দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন ।”

আমরা এই(গণতান্ত্রিক) সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করতে চাই না হোক তা আমেরিকায় অথবা কোন একটি মুসলিম দেশে। ইহুদীরাই একমাত্রসকল সরকার ব্যবস্থায়(যার অধীনেই তারা ছিল) অনুপ্রবেশ করেছে হোক তা আল-আন্দালুস (ইসলামিক স্পেন) ও ওসমানীয় খিলাফা অথবা আজকের পশ্চিমা সরকারসমূহ। তাদের(ইহুদীদের) গোপন বিষয়বস্তু আছে, আমাদের(মুসলমানদের) নাই।

ইহুদী ও তাদের দোসর মোনাফিকরা রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সরকার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল এবং কুরআন দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলঃ

“এবং এক দল কিতাবধারী [একে অপরকে] বলাবলি করছিল, মুমিনদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুতে তা বিশ্বাস কর আর দিনের শেষে তা

অস্বীকার(বা পরিত্যাগ) কর যাতে তারা(অর্থাৎ মুমিনরা) ফিরে যায় [অর্থাৎ, তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে]”

সুতরাং তারা মুমিনে পরিণত হবে এবং মুসলিমদের মাঝে আসবে শুধুমাত্র দিন শেষে তা পরিত্যাগ করার জন্য। আল্লাহ মোনাফেকদের বিষয়েও বলেছেন যারা মুমিনদের সাথে বসবে এবং যা শুনবে তা ইহুদীদের নিকট পৌছে দেবে।

সুতরাং,যারা বলে আমাদের এই(গণতান্ত্রিক) সিস্টেমের সাথে থেকে এটিকে পরিবর্তন করা উচিত তারা মুসলমানদের পথ অনুসরণ করছে না এবং যদি চারিত্রিকভাবে তারা মুসলিম হয়ে থাকে তবে তারা ব্যর্থ হবে কারণ অনুপ্রবেশ মুসলিম আচারণের সাথে খাপ খায় না।

কিন্তু যদি তারা এই(গণতান্ত্রিক) সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম(বা সফল) হয় তাহলে তা প্রমান করে যে, তাদের চরিত্র ইহুদী বা মোনাফিকদের চরিত্রে পরিনত হয়েছে, মুসলমানদের চরিত্রে নয়।

একটি বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত আর তা হচ্ছে, যারা ইসলামী পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমান রাজনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে কাজ করেছে তারা শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে, যাদের প্রক্রিয়ায় রয়েছে কূটনৈতিক, রঙ-বদল, বস্তুবাদী ও কৌশলী ইত্যাদি শব্দের সকল নেতিবাচক অর্থসমূহ।

তারা হয়ত ইসলামী আন্দোলনের শক্ত তারবিয়াহ কর্মসূচির মধ্যে পালিত হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর রাজনৈতিক অঙ্গনে তারাই নেকড়েতে পরিণত হয়েছে, যাকে তারা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল।

আমি এইসব আমার নিজ চোখেই দেখেছি যা আমার পরিচিত মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং ইয়েমেন ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের এক নেতা বলেছেনঃ “আমরা তাদেরকে ভেড়া হিসাবে নেকড়েদের জগতে পাঠাই একটি কঙ্কাল সাবাড় হিসাবে ফেরত পেতে।”

আপনি যদি জীবন্ত উদাহরণ চান; এটি দেখতে যে, সিস্টেমের(গণতান্ত্রিক সিস্টেমের) মধ্যে থেকে কাজ করলে ফলাফল কি হয় তাহলে সুদান ও তুর্কির চেয়ে বেশী দূর তাকানোর দরকার নেই। দুই দেশেরই ক্ষমতাসীন দলগুলো

ইসলামীক আন্দোলন দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অন্য সবার মত পঁচা ও দূষিত পরিবেশে গিয়ে শেষ হয়েছে ।

হিজবুত তাহরীরের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যা আপনি আপনার প্রশ্নে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, আমি প্রথম হিজবুত তাহরীরের সদস্যদের সংস্পর্শে আসি ৯০'র শুরুতে জর্ডানে এবং তারা বেশ তর্কপ্রবণ কিন্তু শিষ্টাচারসম্পন্ন ও ভদ্র।

হিজব সম্পর্কে আমি প্রথম জেনেছিলাম তাদের কাছ থেকেই এবং তারা ছিল এই দলের কেন্দ্রীয় সদস্য। উম্মাহকে খিলাফা সম্পর্কে সজাগ করতে হিজবুত তাহরীর একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

তারা আরো ভুমিকা রেখেছে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার সেই ভুল মতবাদ প্রতিহত করতে যা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত না।

যাই হোক খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হিজবুত তাহরীরের পদ্ধতি কাজ করবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত নুসরাহ না আসে ততক্ষণ নুসরাহর জন্য অপেক্ষা করা – একটি অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করা।

গোত্রগুলো ও সামরিক প্রধানরা নুসরাহ দিবে আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে, সোজা-কথায় তাদের আলোচনার মাধ্যমে জয় করা যাবে না। তারা শুধুমাত্র তখনই বিজীত হবে যখন তারা দেখবে, এক দল মুমিন তারা যা বলে তাই করে এবং তাদের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করে আল্লাহর রাহে।

এটাই, যা অন্যদের অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। এই দ্বীনকে নুসরাহ দেয়া ক্ষমতাবান ব্যাক্তিদের দুটি সফল কাহিনী হল, ইরাকি বাথ রেজিমের কিছু প্রাক্তন অফিসাররা যারা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল এবং দুদাইয়েভ, চেচনিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, যে সোভিয়েত সেনার উচ্চ মর্যাদার অফিসার ছিল।

নুসরাহর এই উভয় সফল উদাহরণ কোন বিতর্ক, বিক্ষোভ ও পুস্তিকার মাধ্যমে অর্জিত হয় নি বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত মুজাহিদিনদের জীবন্ত উদাহরণ দেখেই অর্জিত হয়েছে।

এটি আমাকে খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চতুর্থ পদ্ধতির দিকে ধাবিত করেছে এবং তা হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে। আপনি এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা হল, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির অনুরূপ যে

রাসূলুল্লা(সঃ) প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরে জিহাদ করেছেন।

আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উপেক্ষা করছেন আর তা হল, যখন রাসূলুল্লাহ(সঃ) মদিনা প্রতিষ্ঠা করেন তখন কোন আক্রান্ত ইসলামিক ভূখন্ড ছিল না।

এটা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান পার্থক্য নয়?

আজ মুসলিম বিশ্ব বেদখল এবং আমাদের আলেমদের বিবৃতি স্পষ্ট যে, মুসলিম ভূমি মুক্ত করতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন।

যখন কোন কিছু ফরযে আইন হয় তখন তাই ফরযে আইনই। আপনি তা অন্যথায় অনুমান বা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এর নিয়ম সুস্পষ্ট এবং এর প্রয়োগও সুস্পষ্ট।

সুতরাং আপনার যদি জিহাদকে খিলাফা প্রতিষ্ঠার পন্থা বলে বিশ্বাস নাও হয় তবে আপনি এ বিষয়ে একমত যে জিহাদ ফরযে আইন, যেখানে হিজবুত তাহরির একমত না।

আর যেই জিহাদ ফরযে আইন এবং যা জিহাদ আল-দাফা(অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক জিহাদ) তাতে অংশগ্রহণের জন্য ঈমাম/নেতা, অভিভাবক, স্বামী, ক্রীতদাসের মালিক বা ঋণদাতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আবার বাস্তব জগতে এর প্রমাণ দেখার পরও কেনই বা আমরা এই বিষয়ে তর্ক করি। দুইটি সর্বাধিক সফল (যদিও তা নিখুঁতহওয়া থেকে অনেক দূরে) উদাহরণ হল, গত দশকের আফগানিস্থানের তালেবান ও সোমালিয়ার ইসলামী আদালত। উভয় আন্দোলনই ক্ষমতায় গিয়েছে নির্বাচন বা তর্কের মাধ্যমে নয় বরং জিহাদের মাধ্যমে।

তাদের(অর্থাৎ, পরাজিতদের) পতন এজন্য নয় যে তারা বিফল ছিল বরং এই উম্মাহই তাদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করেছে। অধিকন্তু, যদিও এখানে-সেখানে একটি দু'টি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয় এসেছে তবুও যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি।

যদি আপনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকান এবং মনোযোগ সহকারে খেয়াল করেন তাহলে অনুধাবন করতে পারবেন যে শত্রুরাই রক্তাক্ত হয়ে মরছে, মুসলমান যোদ্ধারা না। অতি শীঘ্রই সংখ্যা কোটিতে দাঁড়াবে।

কারণ, সাধারণত বিভ্রান্তি যে জিহাদ বলতে কি বুঝায়, নফসের জিহাদ নাকি তলোয়ারের জিহাদ? আমি একচেটিয়াভাবে একটি বা অপরটিকে বুঝাচ্ছি না এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথকও করছি না। আমি জিহাদ বলতে যা বুঝাচ্ছি তা এই নয় যে, অস্ত্র ধরো ও যুদ্ধ কর।

জিহাদ এর চাইতেও বৃহত্তর কিছু। আমি এই প্রসঙ্গে জিহাদ বলতে যা বুঝাচ্ছি, তা হল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ও শত্রুকে পরাভূত করতে এই উম্মাহর সামষ্টিক প্রচেষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো তোমার জান, তোমার সম্পদ ও তোমার মুখ দ্বারা।

ক্লসউইজ এটিকে “সামষ্টিক যুদ্ধ” আখ্যা দিয়েছে কিন্তু ইসলামীক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। এটি যুদ্ধক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ এবং মানুষের হৃদয় ও মনেরও একটি যুদ্ধ।